অধ্যায় ২

ভারতীয় রাজনীতি ও স্বার্থগোষ্ঠী (Indian Politics and Interest Groups)

২.১ স্বার্থগোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ ঃ

যে কোনো দেশের রাজনীতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করার জন্য শুধু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, সংবিধান বহির্ভূত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এ কারণেই শুধু সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণ নয়, সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার পদ্ধতি বর্তমানে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯০৮ সালে আর্থার বেন্ট্‌লের বই "The Process of Government" প্রকাশ হওয়ার পর থেকে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। ভারতের মতো একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে সমাজ বৈচিত্র্যে ভরা ও বহুত্ববাদী প্রকৃতির সেখানে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ গড়ে উঠেছে এবং স্বার্থগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতও দেখা গেছে। স্বভাবতই বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে নানা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হোল সরকারী ক্ষমতা লাভের চেষ্টা না করে সরকারের সিদ্ধান্তগুলি যাতে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল হয় তার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। তাই একদিকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলগুলি থেকে পৃথক কারণ ক্ষমতা দখল করা এদের লক্ষ্য নয়, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য হোল যে উভয়েই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

ডেভিড ট্রুম্যান গোষ্ঠীগত রাজনীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর মতে, গোষ্ঠী হোল নানা ব্যক্তির সমষ্টি যার মূলে থাকে এক বা একাধিক মনোভাবের অস্তিত্ব। অংশীদারী মনোভাবই হল স্বার্থের উৎস। আর্থার বেন্টলেও বলেন যে, স্বার্থই হোল গোষ্ঠীর ভিত্তি। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সমষ্টিগতভাবে সরকারের কাছে তাদের দাবীগুলি পেশ করে।

স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে দুটি মতামত উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, অ্যালান বলের মতে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হোচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যরা অংশীদারী মনোভাবের বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর মতে, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হোল এক শ্রেণীর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একই জাতের বা শ্রেণীর উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্য থাকে যার থেকে সৃষ্টি হয় অংশীদারী মনোভাব। যেমন—ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি গোষ্ঠী। দ্বিতীয়ত, এইচ. জিগলার বলেন যে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এমন এক সংযুক্ত জনসমষ্টি যারা সরকারী ক্ষমতায় অংশগ্রহণ না করে চাপ সৃষ্টি করে সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে বলা যায় যে, সব চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীই হোল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কিন্তু সব স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়। যেমন—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলিকে স্বার্থান্বেষী বলা গেলেও সেগুলি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়। সোজা কথায় বলা যায় যে, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হোল এমন এক জনগণের সমষ্টি যার

সাধারণ এক বিশেষ লক্ষ্যের ভিত্তিতে মিলিত হয় এবং এই নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা দেখা যায়।

ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতাতে যেমন বহু দলের অস্তিত্ব আছে, তেমনি বহু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীরও উপস্থিতি দেখা যায়। অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই এই গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক বাস্তবতায় স্বার্থগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বাধীনতার পূর্বেও দেখা গেছে, যদিও গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা ও ভূমিকা স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্বেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা হোয়েছে। প্রধানত চার ধরনের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, হ্যানসন ও ডগলাস ভারতের গোষ্ঠীগুলিকে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) সাবেকী সামাজিক কাঠামোভিত্তিক গোষ্ঠী যেগুলি জাতি, ধর্ম, উপজাতি, ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যেমন—রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, চার্চ অফ নর্থ বা সাউথ ইণ্ডিয়া, গোর্খালীগ, নাগা জাতীয় সম্মেলন, তামিলনাড়ুতে নায়ার গোষ্ঠী, ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি ইত্যাদি। (২) সমাজের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কেন্দ্রগুলি যেমন—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত গোষ্ঠী। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন যেমন—চেম্বার অফ কমার্স, কৃষক সংগঠন যেমন—সারা ভারত কিষাণ সভা, শ্রমিক সংঘ যেমন—আই.এন.টি.ইউ.সি এবং ছাত্র সংগঠন যেমন—ছাত্র পরিষদ, স্টুডেন্টস ফেডারেশন প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, এ.এইচ.ডক্টর ভারতের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে দুভাবে ভাগ করেছেন—(১) প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী (Institutional Groups), যেগুলির দৃষ্টান্ত দেখা যায় আইনসভা, আমলা, ব্যবসা, কৃষক ও শ্রমিক ইত্যাদি সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে। (২) স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠী (Anomic Groups) যেগুলির মধ্যে আছে মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ বা গোহত্যা নিবারণ সংক্রান্ত গোষ্ঠী, হিংসার মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূরণ করার গোষ্ঠী যেমন—United Liberation Front of Assam (ULFA), সারা অসম ছাত্র ইউনিয়ন (AASU) ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, সেলিগ হ্যারিসন আবার গোষ্ঠীগুলিকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত গোষ্ঠী যেমন—শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়ী সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক গোষ্ঠী ইত্যাদি। (২) সামাজিক সম্পর্ক ভিত্তিক গোষ্ঠী যেমন—ধর্মভিত্তিক জামায়েত-ই-ইসলামী বা জাতভিত্তিক তফসিলী জাতি ফেডারেশন প্রভৃতি। (৩) গান্ধীবাদী গোষ্ঠী যেমন—সর্বোদয় আন্দোলন, সর্বসেবা সংঘ প্রভৃতি।

চতুর্থত, অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল চার শ্রেণী গোষ্ঠী উল্লেখ করেছেন—(১) স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠী, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিক্ষোভ, হিংসা প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ULFA, নকশালপন্থী সংস্থা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। (২) সাংগঠনিক গোষ্ঠী, যেগুলি স্বার্থের গ্রন্থীকরণের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়, যেমন—শ্রমিক সংঘ আই.এন.টি.ইউ.সি বা ব্যবসায়ী সংঘ ফিকি (Federation of Indian Chamber of Commerce). (৩) অসাংগঠনিক গোষ্ঠী যেগুলি ব্যক্তি, পরিবার, ধর্ম, বংশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে স্বার্থ গ্রন্থীকরণের চেষ্টা করে, যেমন—জাতভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী

প্রভৃতি। (৪) প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী যারা সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে স্বার্থের সংহতিকরণের চেষ্টা করে। আইনসভা, আমলাতন্ত্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে এরূপ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়, যেমন—কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি, আই.এ.এস.অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি। আমলা প্রতিনিধি ICS কর্মী এল. কে. ঝার প্রভাব একসময়ে ছিল সুদূরপ্রসারী। কুলদীপ নায়ার তাঁকে "Super Secretary" বলে অভিহিত করেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী হিসাবে আমলাতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২ ভারতীয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

রাজনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্তমানে গোষ্ঠীতত্ত্বের প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপের উন্নত উদারনৈতিক দেশগুলির মধ্যে। ভারতীয় রাজনীতিতেও গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের গোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনার পূর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির কয়েকটি অভিনবত্ব মনে রাখা প্রয়োজন—(১) ভারতের সমাজব্যবস্থা বহুত্ববাদী। বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতি এ দেশে গোষ্ঠীর ভূমিকার উপর প্রভাব ফেলেছে, যার জন্য পশ্চিমের গোষ্ঠী-রাজনীতির মডেল এ দেশে প্রযোজ্য নয়। (২) ভারত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হওয়া সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কিছুটা উদ্বুদ্ধ হোয়েছে। তাই রাষ্ট্রের ভূমিকা এদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হোয়েছে। (৩) ভারত উন্নয়নশীল দেশ। তাই এখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সুদৃঢ় হোয়ে ওঠেনি। সামাজিক বিভিন্নতা ও অর্থনৈতিক সমস্যা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্য পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হোয়েছে। উপরোক্ত বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় ঃ

প্রথমত, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি ও গোষ্ঠীগুলি একে অপরকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজে পায়। রজনী কোঠারী বলেছেন যে, ভারতে গোষ্ঠীগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় না, বরং রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই তারা প্রভাব বিস্তার করতে অধিকতর সমর্থ হয়। অন্যদিকে, দলগুলিও গোষ্ঠী গঠন করে তাদের প্রাধান্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে। যুব কংগ্রেস, ছাত্র সংসদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ইত্যাদি ছাত্র গোষ্ঠীগুলি যথাক্রমে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় জনতা পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় দলগুলির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে কিছু স্বার্থগোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার বাইরে আসার চেষ্টা করেছে, যেমন—SEWA (Self Employed Women's Association), উত্তরপ্রদেশে মহেন্দ্র সিং তিকায়েতের ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন, মহারাষ্ট্রে শ্বেতকারী সংগঠন প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকে তৃণমূল স্তরে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে দ্বৈত রাজনৈতিক সংস্কৃতির (Political bi-culturalism) পরিচয় পাওয়া যায়। এই দ্বিবিধ সংস্কৃতির একটি হোল প্রাচীন গতানুগতিক

পদ্ধতি অনুসরণ করা, আর অন্যটি হোল আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বন করা। গতানুগতিকতার ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মে অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। গোষ্ঠীগুলির কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের স্বার্থরক্ষা ও প্রভাব বিস্তারের জন্য আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেমন—সরকারের বিভাগগুলিকে প্রভাবিত করা, নিজেদের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের ঐসব বিভাগে নির্বাচিত করা, রাজনৈতিক দলকে আর্থিক সাহায্য দান করা, স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রভাবশালী আমলাদের নানা উপহার প্রদান করা ইত্যাদি। একই সঙ্গে অনেক সময় গোষ্ঠীগুলি সাবেকী পদ্ধতি যেমন ধর্ম, জাতপাত, ভাষা ও আঞ্চলিক আনুগত্য প্রভৃতির মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই বৈপরীত্যের অবস্থান সম্পর্কে কোচানেক একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর পিছনে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একদিকে যেমন পরিবার ও জাতপাত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও শত্রুতামূলক মনোভাব অনেক সময় গোষ্ঠীগুলিকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ বা স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে অসফল করে তোলে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা অশুভ প্রতিযোগিতা শেষপর্যন্ত তীব্র সংঘর্ষে পরিণত হয়। মাইরণ ওয়েনার এই সমস্যা শ্রমিক সংঘগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। এর পরিণতি হোচ্ছে, ওয়েনারের ভাষায়, "fragmented trade union movement" বা শ্রমিক আন্দোলনের খণ্ডীকরণ।

চতুর্থত, ভারতে গোষ্ঠীগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হোল যে, এদের মধ্যে স্থায়ী রাজনৈতিক আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মতো গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করে। যেমন, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি তাদের আনুগত্য প্রথমে কংগ্রেস দল থেকে জনতা দলের প্রতি পরিবর্তন করেছিল, আবার ১৯৯৯ সালের নির্বাচনের পর বি.জে.পি-র দিকে আকৃষ্ট হোয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকরণের অভাব আছে।

পঞ্চমত, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একটি বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্যের অভাব থাকায় গোষ্ঠীগুলি অনেক সময় তাদের স্বার্থসিদ্ধি বা দাবী আদায়ের এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলির এক সাধারণ পদ্ধতি হোচ্ছে লবি করা। কিন্তু ভারতে এই পদ্ধতি অনেক সময় পরিত্যাগ করে হিংসামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেমন—বন্‌ধ, ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে গোষ্ঠীগুলির আচার-আচরণ দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠত, ভারতীয় রাজনীতিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় শ্রেণীর গোষ্ঠীর উপস্থিতি দেখা যায়। অনেক সময় এক বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সাময়িকভাবে একটি গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের জন্য অন্ধ্র মহাসভা বা তেলেঙ্গানা সঙ্কট মোচনের জন্য তেলেঙ্গানা প্রজাসমিতি গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ব্যবসায়ী সংঘ, কৃষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি স্থায়ী প্রকৃতির। আবার আই.এন.টি.ইউ.সি বা সারা ভারত কিষাণ সভার মতো জাতীয় স্তরে কর্মরত গোষ্ঠী যেমন দেখা যায়, তেমনি আঞ্চলিক স্তরের সংকীর্ণ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ গোষ্ঠীর অস্তিত্বও দেখা যায়, যেমন—কেরালার নায়ার সার্ভিস সোসাইটি বা নাগাল্যাণ্ডের নাগা জাতীয় সম্মেলন।

উপসংহারে ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির ভূমিকার বিবর্তনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শুরুতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ও প্রধানমন্ত্রীর অত্যধিক শক্তিশালী পদমর্যাদার জন্য গোষ্ঠীগুলির দুর্বলতা দেখা গেছে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য কমে যাওয়ায় গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ শক্তিশালী হোয়ে উঠেছে। বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে এমনও দেখা গেছে যে, কিছু গোষ্ঠী সরকারী নীতি নির্দ্ধারণে সাহায্য করছে। যেমন—১৯৭৯ সালে সরকারের গম সংক্রান্ত নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে All India Foodgrain Dealers' Association-এর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সুতরাং ভারতীয় রাজনীতিতে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত হোয়েছে আর এই বিবর্তনের রূপটি এদেশে গোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনায় এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে।

২.৩ ভারতের প্রধান স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ঃ

(ক) ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমূহ (Business Groups) ঃ

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য যে কোন সমাজের এক অমূল্য উপাদান। ব্যবসা-বাণিজ্যের সংরক্ষক হিসাবে গড়ে ওঠে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি যারা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালকদের সংস্থাগুলি এদেশের রাজনীতিতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিসাবে প্রভাবশালী হোয়ে উঠেছে। অনেকে মনে করেন যে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠীই ভারতের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী ও সফল গোষ্ঠী। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই গোষ্ঠীগুলি সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের উপর যতোখানি চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হোয়েছে ততোখানি অন্য কোন স্বার্থগোষ্ঠী পারেনি।

ভারতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত করে তোলার কাজে কয়েকটি উপাদান সাহায্য করেছে। **প্রথমত,** ধর্ম, জাত-পাত, পরিবার ইত্যাদি উপাদানগুলির ভিত্তিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হোতে দেখা যায়। এই উপাদানগুলির মধ্যে পরিবারের অবদান অধিক। ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, আম্বানী, মোদী প্রভৃতি পরিবারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। **দ্বিতীয়ত,** বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেও বাণিজ্য সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। যেমন—মাড়োয়ারী, গুজরাটী, পার্সি সম্প্রদায়গুলি এদেশে বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। **তৃতীয়ত,** ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি গড়ে তোলার জন্য এক ধরনের মানসিকতা বা সংস্কৃতির প্রয়োজন যা সব মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ঘিরেই ভারতে বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। **চতুর্থত,** জাতভিত্তিক সচেতনতা অনেক সময় ব্যবসায়ী সংস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। ভারতে জাত ব্যবস্থার যে স্তর বিন্যাস দেখা যায় সেখানে বৈশ্য সম্প্রদায়ের উপরেই প্রথমে বাণিজ্য করার দায়িত্ব ছিল। পরবর্তীকালে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য জাতের ব্যক্তিরাও এই কাজে লিপ্ত হয়।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ও বিবর্তন ঃ ভারতে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব ও বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে রাজনীতির সঙ্গে গোষ্ঠীগুলি জড়িত ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে একদিকে সামাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন ও অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন এ দুটির